International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 2800)
Volume-III, Issue-VI, May 2017, Page No. 29-49
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

দ্বিজ শিবচরণের ‘গৌরীমঙ্গল’ : অনালোচিত ও অমুদ্রিত পুঁথির আলোচনা

ড. খোকন কুমার বাগ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

'Mangalkabya' is the wealth in Mediaeval Bengali literature. We know, Manasamangal, Chandimangal and Dharmamangal are main branches in Bengali Mangalkabya. There are many secondary Mangalkabyas, like Raymangal, Sitalamangal, Kamalamangal etc. Gourimangal also a secondary Mangalkabya. We know one of the poet of Gourimangal is Kabichandra. In recent past we have seen another two unpublished and undiscussed manuscripts of Gourimangal Kabys by Vishak Rasik Roy and Kabi Dwija Shivacharan Das. The main story and event of other Mangalkabyas are same in same group. Like, in Manasamangal, there are many poet, but, story and event of this Kabya is same. In the other hand, in Gourimangal 's strory and events are different for different poets.

Dwija Shivacharan wrote his Kabya in 1798. The poet presented a new idea in this kabya i.e. Mahishasur is a fan of Durga. Nishumbha also a fan of Kalika. Dwija Shivacharan to adjustment among the cult of Sakta, Saivya and Baishnava. It is very important to know the society and culture of eighteenth century 's Bengal.

‘গৌরীমঙ্গল’ নামে বেশ কয়েকটি পুঁথি পাওয়া গেছে। কিন্তু, এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে স্বতন্ত্র। বিশেষত, বিষয়বস্তুর পার্থক্য প্রতিটি গৌরীমঙ্গলে সুস্পষ্ট। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় কবিভেদে বিষয়বস্তুর পার্থক্য তেমন চোখে পড়ে না। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণ দেব, জগজ্জীবন ঘোষাল বা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের বিষয়গত কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। আবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও দ্বিজমাধব, কবিকঙ্কণ বা মানিক দত্তের কাব্যেরও মৌলিক কোনো তফাত আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু, আমরা গৌরীমঙ্গল কাব্যের যে-সব পুঁথি দেখেছি তাতে দেখা যাচ্ছে, এক-একজন কবির বর্ণনীয় বিষয় এক-এক রকম। যদিও, মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী কাব্যের শেষে গৌরীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পুঁথি পরিচয় : এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতার সংরক্ষণশালায় সংরক্ষিত ‘গৌরীমঙ্গল’ কাব্যের পুঁথির নং BANGA 23-24। পুঁথিটি আধুনিক পুস্তকের মতো বাঁধাই করে দুটি পৃথক পুঁথির সমষ্টি। সেই জন্য পুঁথির নং দুটি। প্রথম পুঁথিটি আমাদের আলোচ্য ‘গৌরীমঙ্গল’ কাব্যের এবং দ্বিতীয়টি হল ‘গঙ্গামঙ্গল’ কাব্যের। পৃষ্ঠার পরিমাপ ৩১.৫ সেমি × ২২ সেমি। বোঝা যায় সাধারণ পুঁথি থেকে আয়তনে পৃথক। পৃষ্ঠার নম্বর সাধারণ পুঁথির মতো নয় (পত্র বা folio নেই) অর্থাৎ একই পত্রের ‘ক’ বা ‘খ’ (a, b) —এভাবে নয়, আধুনিক গ্রন্থের মতো ১ থেকে ১৩৩

পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পুঁথিটির প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্টিকার দেওয়া আছে এবং শেষে অর্থাৎ ১৩৩ পৃষ্ঠায় নীচের দিকে ইংরেজিতে লেখা আছে "Received/ 17th July, 1824" । এই তারিখ হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পুঁথিটি গ্রহণের তারিখ। এরপর, দ্বিতীয় পুঁথি 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যের পুঁথি শুরু। গঙ্গামঙ্গল পুঁথির পৃষ্ঠা ১ থেকে ১১৩। এই পুঁথির কলেজে গ্রহণের তারিখ 14th April, 1823। বোঝা যায়, পুঁথি দুটি পৃথক-পৃথকভাবে ফোর্টউইলিয়াম কলেজে এসেছে। পরবর্তী কালে আধুনিক পুস্তকাকারে গ্রন্থিত হয়েছে।

পুঁথির বর্ণগুলিতে প্রাচীনতার ছাপ আছে তবে কোনো-কোনো বর্ণ পুরোদস্তুর আধুনিক। 'অ', 'আ', 'জ' -এর মধ্যে উড়িয়া হরফের প্রভাব আছে। 'ন' ও 'ণ' স্বতন্ত্র অবয়বে প্রতিষ্ঠিত। 'ন' ও 'ল'-এর পার্থক্যও বোঝা যায়। 'শ', 'স'-র ব্যবহার বোঝা যায়। তবে 'শ'-র আধুনিক বর্ণ যেমন আছে তেমনি অন্য রূপও রয়েছে; যেমন কখনো-কখনো 'শ' 'ণ'-র মতো। অর্থাৎ শ-র যে দুটি ডিম্বাকৃতি গুটুলির একটা আছে। 'ং' ও 'ৎ'-র রূপ আধুনিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ত', 'ৎ' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে; বিশেষ করে শব্দান্তে, যেমন : বেষ্টিৎ। 'য'-র ব্যবহার থাকলেও 'য' ও 'য়'-এর পার্থক্য নেই। প্রায় সর্বত্রই 'য', 'য়' রূপে উচ্চারিত। 'ঈ', 'ঙ', 'জ্ঞ'-র রূপ প্রায় একই। 'ঈ'-তে কেবল একটি ঊর্ধ্ব চৈতন আছে। 'ত্ব' ও 'ত্য' প্রাচীন হলেও কখনো-কখনো আধুনিক 'ত্য' রূপে লিখিত হয়েছে। অধিকাংশই ক্ষেত্রেই 'কু'-এর আধুনিক রূপ লিখিত, অবশ্য প্রাচীন 'কু'-এরও রূপ লক্ষিত হয়। কখনো-কখনো 'য়'-কে 'অ' এবং 'য়া'-কে 'আ'-এর উচ্চারণে ব্যবহার করা হয়েছে। তোলাপাঠের ব্যবহার নেই। ভুল বানান বা ছাড়ের সংশোধনী নির্দিষ্ট স্থানের পার্শ্বে (কাছাকাছি স্থানে) লিখিত আছে। সমগ্র পুঁথিটি একজন ব্যক্তিরই হস্ত-লিখিত।

পুষ্পিকা:

"ইতি শ্রীগৌরীকুশলম্বাদ পুস্তক সমাপ্তঃ। তৎ সৎ সাক্ষর শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মণ। পুস্তকস্য সমাপণ মিতি।।"

এখানে লিপিকর প্রমাদ লক্ষিত 'শ্রীগৌরীকুশলম্বাদ' শব্দে। আসলে হবে 'শ্রীগৌরীকুশল- সম্বাদ'। লিপিকর তাঁর লিপিকালের সাল বা তারিখ কিছুই উল্লেখ করেননি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধিগ্রহণের তারিখ ১৭ জুলাই, ১৮২৪, সুতরাং এর পূর্ববর্তী কোনো সময়ে এই পুঁথিটি লিপিকৃত।

কবির আবির্ভাবকাল ও কবি পরিচয়: কবি মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মতো হেঁয়ালির আশ্রয়ে জন্ম ও কাব্যরচনার কাল বলেছেন। কবি লিখছেন—

একাদশ বেদ একবৃন্দু বাম হাতে।
কহি নিজ জন্ম এই শুন আষাঢ়েতে।।
বার সন যেতে কবি বয়েশ গণনা।
ছান লয় হইল তায় করো বিবেচনা।।
না বুঝিলে পঞ্চদশ বুঝিলে তা কই।
পঞ্চাশের বাড়া ঊনবিংশতি একই।।
করিলাম পুথি এক পক্ষ বিন্দ বাণে।
রাম হইতে গনিতে গনিবে জেবা জানে।। (পৃ ৩৭-৩৮)

এই হেঁয়ালির মর্মে প্রবেশ করা নিতান্ত সহজ নয়। আমাদের মতে প্রথম ছত্রের অর্থ; একাদশ=১১, বেদ=৪, একবিন্দু=০, বাম হাতে-র অর্থ বেদের বামে একটি বিন্দু ধরলে হয় ১১০৪ বঙ্গাব্দ। এরপর বারো সন পর থেকে বয়স গণনা শুরু অর্থে ১১০৪+১২= ১১১৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে কবির জন্ম। 'করিলাম পুথি এক পক্ষ বিন্দ বাণে' -এর অর্থ যদি'একটি পুঁথি লিখলাম পক্ষ=১৫, বিন্দ=০, বাণে=৫ অর্থাৎ ১৫০৫ তাহলে এই পুঁথির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে হয়। কিন্তু, তা সম্ভব নয়। কাজেই অর্থ এমন হতে পারে যে, পুঁথি লিখলাম এক=১, পক্ষ=২, বিন্দ=০,

বাণে=৫ অর্থাৎ ১২০৫ বঙ্গাব্দে। কবি বলছেন, 'রাম হইতে গনিতে গনিবে জেবা জানে' অথাৎ কবি 'রাম হইতে' বা প্রথম থেকে গণনা করতে বলছেন। সমস্যা হল মাঝের দুটি পঙ্‌ক্তি নিয়ে—

না বুঝিলে পঞ্চদশ বুঝিলে তা কই।
পঞ্চাশের বাড়া ঊনবিংশতি একই।।

এই অংশের অর্থ স্পষ্ট নয়। তবে মনে হয়, 'পঞ্চদশ' মানে ১৫ নয়, ৫×১০=৫০। দ্বিতীয় ছত্রের মানে পঞ্চাশের থেকে আরও ১৯ বেশি। মোটামুটি ৬৯ বছর বয়সে কাব্যটি লেখা শেষ হয়েছে ধরলে ১২০৫ বঙ্গাব্দের সঙ্গে জন্মসালের হিসেব মিলে না। মনে হয়, কবি যে জন্ম সালের কথা বলেছেন তা বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতি বিভ্রমের ফল। কেননা, কবি যে বৃদ্ধ এবং মৃত্যুর দিন গুনছেন তা নিজেই স্বীকার করেছেন—

যুবকে বয়েশ গনি মনে হরষিৎ।
পরমায়ু খাট হইল না ভাবে কিঞ্চিৎ।।
যুবা জনে বয়েশ গনিতে চমকিৎ।
পরমায়ু নাই আর জে বাঁচি চকিৎ।।
তবু মন ক্ষণেক ভাবে সে চরণ।
পরিবার মোহে মর্ত্ত ভয় অচেতন।।
আশাছি যে পথে জাইতেছি সঘনে।
পরমায়ু ক্ষায় সদা নিশ্বাস গমনে।।
বসে সুইয়া জাইতেছি মা নাহিক বিরাম।
পরমায়ু জাইতে মাগো না করে বিশ্রাম।। (পৃ ৩৮)

কাব্যের বিষয় বর্ণনায় কবির অতিকথন ও অগোছালো বর্ণনা কবির বৃদ্ধাবস্থাকে স্পষ্ট করে। যাই হোক, ১২০৫ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি রচিত হয়। এই মতের সমর্থন পাই কাব্যের আর একস্থানে। কবি বলছেন—

আদ্য অন্ত এখন এক পক্ষ অন্ত কাছে।
আদ্যের নিকট সিন্ধু সকে এই য়াছে। (পৃ ৪২)

হিসেব অত্যন্ত জটিল। তবে আমাদের অর্থ এইরূপ—এক=১, পক্ষ=২, অন্ত=০ অর্থাৎ ১২০ হল। পরের ছত্রে আছে 'আদ্যের নিকট সিন্ধু সকে' মানে ১-এর পর ৭। তাহলে দাঁড়াল, ১৭২০ শকাব্দ বা ১৭৯৮-৯৯ খিস্টাব্দ। এই সময় কবির বয়েস বলছেন—

না জানিলে একাদশ তার ছয় গুণ।
বয়েশ গনিতে তথা হয় এক নুন।। (পৃ ৪২)

অর্থাৎ একাদশ=১১, ছয়=৬, গুণ=৩। একাদশের ছয় মানে ১১×৬=৬৬ এবং গুণ= ৬৬+৩=৬৯। এর থেকে এক কম। মানে ৬৮ বছর। এই অংশ রচনা কালে কবির বয়স ৬৮ বছর। অর্থাৎ, এর এক বছর পর কাব্য সমাপ্তি হবে। যে-সাল আমরা পূর্বে নির্ধারণ করেছি।

কবি দ্বিজ শিব তাঁর জন্মস্থানের বা গ্রামের উল্লেখ করেননি । তবে বলেছেন তাঁর বসতি গঙ্গার তীরে—

তুমি গঙ্গা তুমি হরি তুমি গঙ্গাধর।
গঙ্গা নাম কল্যে সেই নাম হরিহর।।
জল রূপ হইলা মাগো তুমি এ কারণ।

পশুপক্ষ নরাধম করিতে তারণ।।
নিরাকার ব্রহ্মময়ী নহে এই স্তুতি।
জানে বা না জানে পানে পরশে মুকতি।।
পরশ দুরেতে জল পবনে মুকতি।
ভরষা আমার তব তীরেতে বসতি।।
দক্ষিণোত্তর পূর্ব্ব মাগো এ তিন বাতাসে।
জীবনেতে মুক্ত হইয়া আছে শিবদাসে।। (পৃ ৩১)

গঙ্গার পশ্চিমতীরে কবির বাস ছিল বলে মনে হয়, উদ্ধৃত শেষ দুটি ছত্রে।

কাব্য-কাহিনি ও ঘটনা বিশ্লেষণ: সাধারণত মঙ্গলকাব্যে বন্দনা অংশে প্রথমে গণেশের বন্দনা ও পরে অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা গান দিয়ে কাব্যের শুরু হয়। এই কাব্যে অনুরূপ রীতি অনুসৃত হয়নি। দ্বিজ শিবের 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে প্রথমেই আছে গুরুবন্দনা। কবি গুরুকে দেবতার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন—

গুরু শক্তি গুরু শিব গুরু কৃষ্ণনাম।
বেদাগম পুরাণে একথা জানিলাম।।
মন্ত্রদাতা গুরুকে করিবা এ বিচার।
যেমন হইলা রাম কৃষ্ণ অবতার।।
দশমহাবিদ্যা আর দশ অবতার।
গুরুর অধিক নন কি কব বিস্তার।। (পৃ ১)

কবি এই কাব্যে তন্ত্রনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তন্ত্রে গুরুপদই কাম্য।

কবি সমকালীন প্রেক্ষিতে আধুনিক। কবি লিখছেন দেবতার মঙ্গলগান, অথচ গুরুকেই দেবতার অধিক বলছেন। কবির ভাবনায় গুরুবন্দনা করলে অন্য কোনো দেবতার বন্দনা নিষ্প্রয়োজন। তাই হয়তো তিনি আর কোনো দেবতার বন্দনা করেননি।

অন্যান্য কাব্যের মতো কবি এ-কাব্যেও প্রথমে (পৃ ২) সমগ্র কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। কাব্যের প্রথমেই কবি দ্বিজ শিব কালী-কৃষ্ণ-শিব অর্থাৎ শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈবের ভেদ ঘুচিয়ে তিনকে এক রূপে প্রকাশ করেছেন। দেবতা বা দেবী ছিলেন নিরাকার। ভক্তের কারণে তিনি সাকার হয়েছেন।

গুরু ইষ্ট রূপ দুই দুই বস্তু নহেকেই
এমন কহিলা ত্রীলোচনে।
এরূপ অভেদ জান এ বেদ আগম মান
না বুঝ জিজ্ঞাশো মহাজনে।।
শিবের বচন জানা যে জা করে উপাশনা
সেই ব্রহ্ম বেদাগম মতে।
সাক্ত জানে শক্তি মনে শিবভক্ত শিব জানে
বিষ্ণু জানে বৈষ্ণব মনেতে।। (পৃ ৫)

নিরাকার ব্রহ্মময়ীর সাকার হওয়ার কারণ কবি উল্লেখ করেছেন—

নিরাকার ভেবে বুজা বড় ফেরফার।
সাকার ভাবিয়া বুঝ পাইতে নিস্তার।। (পৃ ৫)

কবি ভেদজ্ঞান দূর করতে আহ্বান জানিয়েছেন—

কর সভে অবধান যে কথায় ভেদ ভান
না শুনিবা সে কথা শ্রবণে।।
শাক্ত শৈব যে বৈষ্ণব গানপত্য যতসব
কথায় আনন্দ হবে মনে।
ভেদক কেবল তুষ্ট আর সর্ব্বেশ্রনে (গুণে) সৃষ্ট
বিফল কি ফল এ বচনে।। (পৃ ৭)

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালীর ইচ্ছায় সৃষ্ট। হরিহরবিধি জলে বসে ধ্যানমগ্ন তখন 'এ তিন' –এর নিকটে শক্তি পচা শব হয়ে আবির্ভূত হলেন। কালী তিনজনকে ছলনা করার জন্য এরূপ গলিত শবের রূপ গ্রণ করেন—

ভাষা আইলা বিষ্ণু কাছে ভুলে তিন সব কাছে
পলাইলা তন্ত্রে এই বটে।।
গন্ধে চারিদিগে বিধি মুখ ফিরাইল যদি
ইথে চারি মুখ হৈল তার।
তথা হইতে শক্তি সেই ভাষে যথা গেলা কই
শুন সর্ব্বে সেকথা বিস্তার
সেই পচা সব (শব) কায় লাগিল শিবের গায়
তবু নাহি শিবের চেতন।
... ...
পচা সব (শব) কীট তায় গলে খসে লাগে গায়
শিব লইয়া করিলা আসন ।। (পৃ ২০-২১)

শিবের এমন ব্যবহারে শক্তি তুষ্ট হলেন এবং কমলা ও সাবিত্রী রূপ গ্রহণ করলেন—বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিনজনের জন্য সত্ত্ব-রজ-তম তিন বর চেয়ে নিলেন।

এই শক্তি নিরাকার ও সাকার এবং প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে বিরাজমান। কালী শিবকে রূপে ভুলিয়ে ছিলেন, আবার কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৃষ্ণকেও ভুলিয়ে ছিলেন—

যদি হরি হারিলা বৈষ্ণবে আমি বলি।
না বুঝে হারিলা হরি যে হরি সে কালী।।
দুজন করিতে খেলা একজন হারে।
তুমি আমি কি করিব এভেদ আকারে।। (পৃ ২১-২২)

কৃষ্ণ প্রথমে যুদ্ধে অসম্মত হলেও কালীর প্ররোচনায় যুদ্ধে লিপ্ত হন। কৃষ্ণ ধনুকে টঙ্কার দিয়ে কালীর ওপর অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করেন। এক সময় সমস্ত শর শেষ হয়ে গেলে পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি কালীর ওপর নিক্ষেপ করলেন। কালী সন্দেশ-ভক্ষণের মতো সব ভক্ষণ করলেন। কৃষ্ণ মনে মনে যুক্তি করলেন কালীর ওপর চক্রাঘাত করবেন কিন্তু, চক্রসহ কৃষ্ণকে (বিষ্ণু) কালী গ্রাস করে ফেললেন : 'চক্র কৃষ্ণ দুই কালী অমনি গিলিলা' (পৃ ২৩)।

কৃষ্ণ কালীর উদরে। এদিকে দেবলোকে দেবগণ নারায়ণকে দেখতে না পেয়ে চিন্তান্বিত। সকলে ব্রহ্মার নিকট গেলেন এবং হরি-নিখোঁজের সংবাদ জানালেন। ব্রহ্মা 'মনন করিয়া' অর্থাৎ ধ্যান করেও নারায়ণের হদিস পেলেন

না। তখন সকলে শিবের নিকট গেলে শিব 'কালীর উদর মধ্যে কৃষ্ণকে দেখিলা' পৃ ২৬)। শিবের অনুরোধে কালী কৃষ্ণকে প্রসব করলেন। কাজেই, কবি—

শিবচরণে বলে সত্য এই বাণী।
আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিলা আপনি।। (পৃ ২৮)

এই কালী সমস্ত ঔজ্জ্বল্যের মূল। চিত্তকে উজ্জ্বল করতে মনে মনে কালীর স্মরণ বাঞ্ছনীয়। যাই হোক, কালী-কৃষ্ণ সকলেই এক এবং অভিন্ন।

কবি বলেছেন, স্নান করে বা না-করে, শুচি হয়ে বা না-হয়ে দুর্গা নামই হল পাপ-রোগের একমাত্র ওষুধ। দুর্গা নামে ছয় রিপুর তাড়না থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কবি কালীর মায়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে নারদের ওপর বিষ্ণুর মায়া বিস্তারের কথা বলেছেন। বিষ্ণু নারদকে ভুলিয়ে ছিলেন—

সরোবর কুলেতে রাখিয়া পাৎ ফুল।
ডুব দিতে হইলা নারী মনেতে ব্যাকুল।।
ভাবে নারদ আমি হইলাম নারী।
কি বিপদ ঘটিল বুঝিতে মনে নারী (নারি)।।
দেখেন চাহিয়া এক অপূর্ব্ব ভরন।
ভোজনের দ্রব্য কত আর বহু ধন।।
... ...
উপনিৎ হইল তথা পুরুসে কজন।
তপন জিনিয়া রূপ মদনমোহন।।
পুরুষ কহিলা শুন হে যুবতী।
ভুল্যাছ আমাকে তুমি আমি তব পতি।।
... ...
ভাবেন মনেতে এই আমি সেই নারদ।
আমার এই পতি কেন এ কি বা বিপদ।। (পৃ ৩৩-৩৪)

আসলে নারদ জলে ডুব দিতেই জলতলে বিষ্ণুর মায়ায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

মহামায়া শিবকে কীভাবে ভোলালেন কবি এবার সে-কাহিনি বিবৃত করলেন : উমা হিমালয়গৃহে যাবেন বলে শিবের নিকট প্রার্থনা করেন। তখন শিব পূর্বের দক্ষযজ্ঞের কথা স্মরণ করে ভীত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, হিমালয়গৃহে দুর্গা গেলে রাজা হিমালয় যদি পূর্বের দক্ষের মতো শিবনিন্দা করেন এবং দুর্গার যদি সতীর মতো পরিণতি হয়! একথা শুনে পার্বতী বললেন—

হীমালয় দক্ষ নয় পরম ভাজন ।
দিবানিশি শিবপদ করেন ভজন।। (পৃ ৩৭)

গিরিশপুর থেকে গৌরীর গিরিপুরে যাবার গানই হল 'গৌরীমঙ্গল'।

পার্বতী পিতৃগৃহে যাবার জন্য শিবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করছেন। কিন্তু, শিব তাঁকে আর পিতৃগৃহে পাঠাতে চান না। কারণ—

না মানি নিশেধকথা গেলা দক্ষযজ্ঞ যথা
নিন্দা শুনি সে তনু তেজিলা।।
নন্দী সাঁপে দক্ষে দুখ হইল ছাগলমুখ
এ কারণে কথা নাহি কই।
জাইবে তুমি পিতালয় পুন জানি কিবা হয়
এহেতু সুমৎ আমি নই।। (পৃ ৩৯)

কিন্তু, দুর্গা শিবের যুক্তি মানতে চান না। তিনি যাবেনই। দুর্গা শিবকে আশ্বস্ত করে বলেন, হিমালয় দক্ষের মতো নন—

কহিলা শিবকে উমা এ প্রবোধ বাণি।
হীমালয় পিতা মোর তব ভক্ত জানি।।
কোন ভয় নাহি তার ভবনে জাইতে।
প্রবোধ মানহ মনে ভয় না হইতে।। (পৃ ৫৬)

ব্যাকুলা পার্বতীকে পশুপতি পিত্রালয়ে যেতে অনুমতি দিলেন—

অনুমতি দিলা শিব হরিষ জননী।
আনন্দে আনন্দময়ী আনন্দদায়িনী।। (পৃ ৫৭)

শিব-শক্তির নিন্দা করলে পশুমুখ হয়। দক্ষেরও হয়েছিল। দেবগণ একদিন মুক্তির কারণ জানতে শিবের নিকট উপস্থিত হলেন। শিব তাঁদের আগমনের কারণ জানতে চাইলে দেবতারা বলেন, 'মুকতি কারণ কে শুনিবে দেবগণ' (পৃ ৫৭) । তখন—

শিবনাম ভাগবতে বসিয়া ভগবতী।
ইঙ্গিতে দেখাল্যে দেবে দেব পশুপতি।। (পৃ ৫৭)

দেবতারা শিবের কথা শ্রবণ করে ফিরে গেলেন। কিন্তু, অগ্নির বিশ্বাস হল না—

সন্দেহ ভাবিতে হইল অগ্নির দুর্গতি।
ছাগপশু করিলা ইঙ্গিতে ভগ(ব)তি।। (পৃ ৫৭)

অগ্নির কাতর প্রার্থনায় দেবী অগ্নিকে শাপমুক্ত করলেন, তবে তিনি মুক্ত হবেন একবছর পর। অগ্নি জানতে চাইলেন এ-সময়কালে সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তাঁর কী হবে ? দেবী বললেন—

যোগ্য (যজ্ঞ) জন্যে পশু রবে তোমার সন্ততি।
যজ্ঞবধ হইয়্যা পাইবে বিধান গতি।। (পৃ ৫৮)

শিব পার্বতীকে পিত্রালয়ে যাবার অনুমতি দিলেন বটে, তবে কেন দেবীকে হিমালয় গৃহে পাঠাতে চান না তার প্রকৃত কারণ শিব বললেন—

তুমি ছাড়া হইলে আমি শিব নহি সব (শব)।
না জানিলা তুমি যদি কত আমি কব।।
অন্নদাতা তুমি অন্ন দিলে আমি খাই।
না দিলে না পাই অন্ন কি য়াছে বড়াই।।

অন্নদাতা হইয়া যদি তুমি জাইবা দুরে।
দিনে অন্ধকারময় হইবে এই পুরে।।
তব হাতে অন্ন পাইয়া নাচ্যা আমি খাই।
অন্নদাতা তুমি আমি কইতে কি জানাই।।
নির্গুণ পালন কর সদা অন্ন দিয়া।
ভুল না আমাকে তুমি হিমালয় গিয়া।।
সিদ্ধি খাই কোথা পাই তুমি গেলে আমি।।
কি সাধ্য আমার সেই আমার শক্তি তুমি।।
দেবালয় জাওয়া নয় সদা মাখি ছাই।
সিদ্ধি ঘোরে ঘোর সদা অন্ধ চক্ষে চাই।।
বাগছাল পরিধান সদা পড়ে খসি ।
বন্ধনে নাহিক রয় যত বান্ধি কসি।।
বাগছাল সাপে বান্দা সে কেন তা রবে।
মোর লজ্জা নাই লজ্জাবাসে হাসে সবে।। (পৃ ৫৮-৫৯)

কাজেই, পত্নীবিচ্ছেদ থেকে মুক্তি পেতে শিবও হিমালয় গৃহে যেতে চান। তিনি সঙ্গে গেলে মোট-পুঁটুলির ভার বাড়বে না। শিব জানান, তিনি সিদ্ধির ঝুলিই কেবল সঙ্গে নেবেন। কিন্তু পার্বতী সর্পের বন্ধনে আবদ্ধ বাঘছাল পরিহিত শিবকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান না । কেননা, ইষর মূলের গন্ধে সাপ পালিয়ে যায়! তবে, তাতে শিবের কিছু আসে যায় না। তাঁর যাওয়ার কারণ অত্যন্ত বাস্তবিক—

শিব কন জাইতে চাই মনে ভয় করি।
যদি তুমি থাকো তথা আমাকে পাশরি।। (পৃ ৫৯)

আদর্শ প্রেমিকের ভয় তো এটাই। কাজেই, শিব এখানে মানবিক প্রেমিক।

এদিকে উমা-বিচ্ছেদে রানির মন বড়ো উচাটন। স্নেহ-পিপাসায় চাতকের মতো চেয়ে থাকেন কন্যার অপেক্ষায়। দূরে কেউ কথা বললেই তাঁর মনে হয়, এই বুঝি গৌরী এল। একদিন সত্যিই গৌরীর আগমন বার্তা শুনে তিনি ধেয়ে যান গৌরী-আনতে—

এরূপ ব্যাকুলা রানি ইতিমধ্যে শুনে বাণি
আইলা গৌরী গিরিপুর মাঝে।
যে রাণী পাগলিনী ধাইল সুনি অমনী
দেখে উমা আনে গিরিরাজে।। (পৃ ৬১)

সংবাদ পেয়ে গিরিপুরবাসীরা ছুটে আসে—মা স্তন্য-কাঙ্ক্ষিত শিশুকে ত্যাগ করে উমাকে দেখতে আসে। নগরে কলধ্বনি ওঠে। স্নেহের ধর্মই হল অকারণে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা, তাই মেনকা—

জিজ্ঞাসা উমাকে রাণী চান্দ মুখে কও বাণী
কি খায়্যাচো পথে মাগো বল।
মুখ শত শশী যেন এমন মলীন কেন
আহা মরি মুখ মাগো তোল।। (পৃ ৬১)

উমাকে দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরা দুঃখ করছেন : ননীর পুতলের মতো উমা কেমন যেন হয়ে গেছে। তাঁর এমন পাগল-বর, তিনি শ্মশানে থাকেন, যাঁর ঘৃণা-লজ্জা-ভয়-অভিমান কিছুই নেই। তিনি দিগম্বর। উমার এমন অবস্থার জন্য সকলে মেনকাকেই দায়ী করেন—

দুঃখের সাগর সেই শিবের ভবন।
কহিতে নাহি হবে দেখো গৌরীর বরণ।।
নাহি কন্যা কার গো নাহিক মাতা কার।
দেখি নাই এমন নির্দয় মন মার।। (পৃ ৬১)

উমার এমন দশা দেখে দুগ্ধ-পোষ্য শিশুও ছলছল নয়নে তাকিয়ে থাকে। একথা শুনে মেনকা বলেন : তিনি শিবতত্ত্ব জানেন না। গিরিরাজ শিবের সাক্ষাৎ পান না । শিবের কোনো তত্ত্বই তাঁরা জানেন না। নগরবাসীরাও বলেন : স্বর্ণ প্রতিমা যেন কালী হয়ে গেছে। তাঁকে গৌরী না বলে কালী বলাই শ্রেয়। রানির মনও গিরিরাজের মতো পাষাণ হয়ে গেছে। যাই হোক, পুরবাসীরা রানিকে বলেন—

পূর্ব্বে গিরিপুরে এই মানবে সে অনুজাই
সারদ উৎসবে মাকে আনে।
জ্বরাতুরা দুঃখিমুখি আগমনে সভে সুখি
ভুলিল সকল দুঃখ মনে।। (পৃ ৬৪)

মহামায়ার আগমনে আনন্দ নেমে আসে এই ধরাতলে। দণ্ডধারী অন্ধজন, সেও আনন্দ করে। সতী নারী পতিসেবা ছেড়ে আনন্দে মগ্ন হয়। কুরূপা সুবেশী হয়ে আনন্দ করে—

ভিক্ষুকে করিয়া ভীক্ষা আগেতে সঞ্চয়।
পরম সুখেতে তিন দিন বঞ্চয়।।
কি কবো আনন্দ কতো সীমা নাই কহিতে।
পলাইয়া দুঃখগণ সে নগর হইতে।।
আনন্দের শিরমণি সারদ উৎসব।
গণনে না আনে অন্য আনন্দ নিরব।। (পৃ ৬৪)

মাতৃ-আগমনে এই শারদোৎসবে শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব সকলেই আনন্দ করে। রাজা রাজ্য পেয়ে সুখী হলে সে আনন্দ সকলের হয় না, কিন্ত শারদোৎসবের আনন্দ সকলের—বালক-যুবক-বৃদ্ধ-জরা সকলেই আনন্দিত হয়। ধনী-নির্ধনী সকলেই সমানভাবে আনন্দ পায়।

এবার কবি দেবীর দশভুজা হওয়ার ঘটনা ব্যাখ্যা করেছেন। এ-প্রসঙ্গেই কবি মহিষাসুরের পিতার বর-প্রাপ্তির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন—

শুন মহীশাসুরের পিতার বিবরণ।
শিবতুল্য পুত্রকামে ভজে ত্রীলোচন।।
সুবস করিয়া সেই কঠীন আসন।
শতৎ মনন করে শিবের চরণ।।
সদাকাল অনসনে করে আরাধন।
শিবসম পুত্র চায় নাহি চায় ধন।।
নাহি চায় অনির্ব্বাণ মুকতি ব্রহ্মপদ।

সদা ভাবে পুত্র লাভে সদাশিব পদ।।
সীৎকালে গলাজলে দিবানিশি থাকে।
পঞ্চাতপা করে সেই চৈত্র বৈশাখে।।
উদ্ধেতে রাখিয়া পদ মস্তক ভূমেতে।
মনে জাগে লোকে দেখে আছে সে ঘুমেতে।। (পৃ ৭০)

এই কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব আবির্ভূত হলেন এবং বর প্রার্থনা করতে বললেন। অসুর বলল, "দিবা পুত্র তোমার সমান" (পৃ ৭০)। কিন্তু শিব বললেন, "আমার সমান একা আমি" (পৃ ৭০)। তবে অসুরের বলবান পুত্র হবে—

স্বর্গ মত্ত পাতাল জিনিবে বলে সেই।
দেবের অবধ্য হইবে ত্রিভূবনে জয়ী।। (ওই)

অসুর শিবকে প্রণাম করে গৃহমুখী হলেন। অন্যদিকে এই বরের কথা শ্রবণ করে দেবতারা ভীত হলেন। কেননা—

নিজদারে যদি হয় অসুর তনয়।।
তবে দেবগণে আর নাহিক নিস্তার। (ওই)

কাজেই, দেবগণ কামদেবকে প্রেরণ করলেন, তাকে অস্থির করার জন্য। তপস্যামগ্ন থাকার জন্য তার নারী-কামনা স্থান পায়নি। এবার তার মনে তীব্র নারীসঙ্গ বাসনা জাগ্রত হল। নিজ পত্নীর কথা চিন্তা করতে-করতে গৃহমুখী হল। কিন্তু—

কামের প্রভাবে আর নারিল জাইতে।
নবীনা মহীষী এক চরে সেই পথে।।
উপগত হইল তাই মদন প্রভায়।
জন্মিল মহীষাসুর এই রূপে তায়।। (ওই)

মহিষাসুর প্রবল প্রতাপে আবির্ভূত হল। দেবতারা তার ভয়ে প্রকম্পিত—

মৈষাসুর দেবগণে করিল এমন।
সিংহের নিকট খীন নকুল যেমন।।
কদলীর তরু যেমন প্রবল পবনে।
অস্থির হইল দেবে সদা ভয় মনে।।
ঝড়ে ধুলা পত্র যেন উড়ে কোথা যায়।
এরূপ দেবগণ কে কোথা পালায়।। (পৃ ৭০-৭১)

ভয়ে দুঃখে দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গেলেন। দেবগণের দুঃখ কথা শুনে ব্রহ্মা দেবতাদের নিয়ে 'বিষ্ণুর ভবনে' গেলেন। দেবতারা বিষ্ণুকে প্রণাম করে তাঁদের দুঃখ-বেদনার কথা জানালেন। সব শুনে ব্রহ্মা-বিষ্ণুসহ সকল দেবতা শিবের কাছে গেলেন। শিবের স্তব করে দেবতারা বললেন : "স্বর্গের রমণী ধর্য্যা লয় মৈষাসুরে" (পৃ ৭১)। দেবগণ ভয়ে স্বর্গছাড়া—

ভয়েতে লুকায়া থাকি মর্ত্তলোক মাঝে।
একারণ অমরগণের প্রাণ বাঁচে।। (পৃ ৭১)

হরিহর প্রজাপতি-দেবগণকে বললেন ভগবতীর স্তব ছাড়া গত্যন্তর নেই। দেবতারা শক্তির স্তব করতে লাগলেন। দেবস্তবে দেবী আবির্ভূত হলেন—

দেবগণ কৈল স্তুতি করিয়া ভকতি।
নির্গত হইল সব দেবের শকতি।।
তেজপুঞ্জ আলোময় উঠিল গগণ।
নয়ণ মুদিল দেখি যত দেবগণ।।
মস্তক করিলে হেঁট চাহিতে চক্ষু যায়।
কোটী ২ সূর্য্যশশী তুলনা নহে তায়।।
শক্তি নিরাকার তার অবঅব (অবয়ব) নাই।
নিরাকার শক্তি তেজ দেখেন সভায়।।
দেবে স্তুতি করে রক্ষা করো মাগো দেবে।
সাকার দেখিলে মনে ভয় যায় তবে।। (পৃ ৭২)

নিরাকার শক্তি দেবতাদের স্তবে সাকার হলেন—ব্রহ্মার তেজে তাঁর চরণ দুটি সৃষ্টি হল; সূর্যের তেজে মুখ এবং বিষ্ণুর তেজে হল বাহু। বসু তেজে 'করাঙ্গুল' (কর+ আঙ্গুল), বরুণের তেজে নাসা ও উরু, যমের তেজে কেশ, অগ্নির তেজে চক্ষু, পবনের তেজে কর্ণ, সন্ধ্যার তেজে ভ্রু, দক্ষের তেজে দন্ত। নিরাকার দেবী এভাবে সাকার হলেন, কিন্তু শত্রু দমনে অস্ত্রের প্রয়োজন তখন—

বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর আজ্ঞা দিলা এই।
জার জেই অস্ত্র আছে অস্ত্র হইবে সেই।। (পৃ ৭৩)

স্বয়ং শিব দিলেন শূল, হরি দিলেন চক্র, ইন্দ্র দিলেন বজ্র, পাশ ও অঙ্কুশ দিলেন বরুণ, 'পুন বিষ্ণু দিলা চর্ম্ম অব খর বাণ' (পৃ ৭৩)। আর, বিশ্বকর্মা করলেন, 'দেবাধি মাকে দান' (পৃ ৭৩)। অগ্নি ঘোরতর শক্তি দিলেন, কাল খর খড়্গদান করলেন, বায়ু দিলেন 'দিপ চর্ম্ম' আর 'তুণ'। বাণ হল সেই তুনের তিন গুণ, যম দণ্ডদান করে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। ঐরাবত, ঘণ্টা দেবীকে দেওয়া হল। দক্ষ দিলেন 'অক্ষমালা চর্ম্ম কমুণ্ডুলে', 'খিরোদা' দিলেন চূড়া ও মণিময় কুণ্ডল। অনন্ত দিলেন 'নাগহার', বরুণ দিলেন শঙ্খ। শক্তিময়ী অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে ভুবনমোহিনী হয়ে ভুবন আলো করে বসে রইলেন।

দেবী ভগবতী স্বপ্নে মহিষাসুরকে দেখা দিলেন, মহিষমর্দিনী রূপে—

সর্পেতে বান্ধিলা মাতা অসুর দুর্জ্জন।
ত্রিশূল হানিলা বুকে কাতর জীবন।।
বাহুতে কামড় দিলা সিংহ পশুপতি।
তাহাতে রুধীর ধারা সদা বহে অতি।।
মৈশাষুর করেতে লইলা চর্ম অশী।
সিংহেকে বধিতে যায় দেবী মুখে হাসি।।
এরূপ সপন দেখি মহীষ দুর্জ্জন।
মনেতে দুঃখিত হইয়া করিলে রোদন।। (পৃ ৭৪)

এই দেবী বহুরূপিণী, আবার ভক্তবৎসলও। তাই, দেখা গেল—

মৈশাসুর ভাবিলে জে দেখিছি সপন।

জীবনের ভরষা নাই পূজি সে চরণ।। (পৃ ৭৫)

কাজেই, মহিষাসুর স্বর্গের সম্পদ-সুখের আশা পরিত্যাগ করে দেবতাদের ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করে দেবীর পাদপদ্মে আশ্রয় নিল। মহিষাসুর স্নান করে আসন গ্রহণ করল। ডান দিকে জবাফুল, বিল্বদল, স্বর্ণপাত্র, চন্দন রাখল। বাম দিকে রইল নৈবেদ্য উপহার; ধূপ দীপসহ অষ্ট গন্ধ-দ্রব্য এবং বহু উপচারে দেবীকে আরাধনা করতে বসল। মৃত্যুভয়ে কাতর মহিষাসুর দেবীপদে কামনা করল—

জনমের মতো এই দেখি ও চরণ।
সকল (সফল ?) জনম করি সধন্য জীবন।।
যেরূপ সপনে মাগো দেখিয়াছি আমি।
সেরূপ আমাকে পুন দেখা দেও তুমি।।
দেখা দিলা ব্রহ্মময়ী হইয়া দশভূজা ।
সারদে যেমন রূপ লোকে করে পূজা।। (পৃ ৭৫)

ভক্তিভরে মহিষাসুর দেবীর নিকট তার জীবন-ইতিহাস ব্যক্ত করে বলল যে, সে শিবের বরপুত্র। সে শিবের কাছে বর প্রার্থনা করেনি, করেছিল তার পিতা। দেবতাদের চক্রান্তে মহিষীর গর্ভে তার জন্ম। তবুও নিজ শক্তি ভুলে সে পর্বতেই ছিল। নারদের পরামর্শে সে স্বর্গ-জয়ের স্বপ্ন দেখে এবং দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গসুখ ভোগ করে—

স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল নিবাসি মোর প্রজা।
বাহু বলে হইলাম সকলের রাজা।। (পৃ ৭৭)

দেবগণ তার ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করেন। দেবতারা যজ্ঞ করলেই মহিষাসুর তাণ্ডব করে। স্বহস্তে রোপিত বিষবৃক্ষকেও কেউ উৎপাটন করতে পারে না। সুতরাং, মহিষাসুরের যুক্তি, শিব নিজ হাতে এই বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন, দেবীর সেই বিষবৃক্ষ ছেদন করা অনুচিৎ। মানবিক গুণের অধিকারী এই মহিষাসুর জীবনের ভাবী পরিণতি জেনে কাতর—

হানিবা ত্রিশূল বুকে ভাবিতে কাতর।
কেমনে সহিব মাগো কাঁপে কলেবর।।
সর্পেতে বান্ধিবা মাগো বিষম বন্ধন।
সর্পের নিশ্বাস বিষে করিব কেমন।।
পুন সিংহি দন্তাঘাতে সংশয় জীবন।
কি উপায় হইবে মোর করি নিবেদন।। (পৃ ৭৭-৭৮)

পুনরায় মহিষাসুর বলল, অমর ও অসুর উভয়েই নিজ কর্ম-ভোগী। অথচ, কেবল তাকেই দোষী করা হচ্ছে। কাজেই, শিব যে-বর দিয়েছেন তা আসলে অভিশাপ, মহিষাসুরের পিতা তা উপলব্ধি করতে পারেনি—

মনেতে রাখিলা দেবীহাতে মৃত্যু হবে।
মুখেতে কহিলা বর না পারিবে দেবে।। (পৃ ৭৯)

কিন্তু, মহিষাসুর প্রকৃত পক্ষে বীর। মৃত্যু-ভয় সে করে না। সে আসলে এই ভেবে দুঃখ পায় যে, এমন মৃত্যু দেখে ত্রিভূবন হাসবে, এমন মৃত্যু আসলে তার অপমান। তার ভয় মৃত্যুভয় নয়, মৃত্যুর কারণ জেনে যাওয়াটাই ভয়ের। মহিষাসুরের কোনো মন্ত্র নেই, যা কিছু সবই বলের প্রতাপে। মহিষাসুর দেবীর স্তুতি করল—দেবীর ইচ্ছাতেই

ত্রিভুবন জানা যায়। দেবীই আদ্যা ও অন্ত্য। দেবী এক কিন্তু দুই রূপ—নারীও পতি। অসুরের দেবীস্তবের মধ্যে আছে, অভিমান ও যুক্তি-সংগত প্রতিবাদ—

বাহুবলে রাজ্য লইতে দোষ বিচারিলা।
তবে না করিয়া খীন কেন বল দিলা।।
দেবপক্ষে দুর্জ্জন মামি (মা+আমি) বটে মা প্রমাণ।
সুরাসুর সুখ ইচ্ছা দুয়ের সমান।।
... ...
স্বর্গ মর্ত্ত সুখের নাহিক কার সাধ।
জার বল নাই সেই না করে বিবাদ।। (পৃ ৮৩)

শিব অসুরকে বল দিয়েছেন। সেই বলের যে-ধর্ম, তাই-ই করেছে—এতে মহিষাসুরের কি-ই বা দোষ।

মহিষাসুরের স্তবে দেবী সন্তুষ্ট হলেন। তিনি মহিষাসুরের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। মহিষাসুর দেবীর পদতল কামনা করে বলল—

না বধো আমাকে মাগো এই রূপে থাকি।
তোমার অতুল পদ সদা চায়্যা দেখি।।
তুমি নিত্যা তব পদে আমি নিত্য রব।
ত্রিভুবনে পূজ্য হইয়া আমি পূজা পাব।
তথাস্তু বলিয়া মাতা হইলা গোপন।
দেখিতে না পায় আর অসুর দুর্জ্জণ।। (পৃ ৮৪)

অন্যদিকে—

ভাষিয়া চক্ষুর জলে গিরি কোথা রাণী বলে
প্রভাতে কি হইবে দশমী। (পৃ ৮৬)

দশমীর প্রভাতে শিব দুর্গাকে নিতে আসবেন। কীভাবে তাঁকে বিরত করা যায়, মেনকা সে উপায় সন্ধান করতে বলেন হিমালয়কে। উমা মেনকার নয়ন-তারা। সেই তারা-হারা হয়ে পড়লে তিনি জিয়ন্তেই মরা-তুল্য হয়ে পড়বেন।

শিব ভিখারি। তিনি পঞ্চমুখে খান। কাজেই, "অন্ন শেষ কিছু নাহি রাখে" (পৃ ৮৬)। উমাকে প্রবোধ দেওয়ার মতো কোনো প্রতিবেশী নেই। কারণ শিব নির্জন শ্মশানে-মশানে থাকেন।

যাথা (যা তা) আনে খায় ঐ উমা বুঝি পায় কই
কেমনে সবে এ দুঃখ মাকে।।
গুণেতে নহেক গন্য বিচারে কেবল সূন্য
কহিয়াছিল গুণময় শিব।
ভাল গূণ শিবে আছে সিদ্ধি খাইয়া ঘোরে নাচে
তুলনা নাই তুলনা কি দিব।। (পৃ ৮৭)

অন্য কারো জামাতা শিবের মতো শ্মশানবাসী বা বিবসন নয়, তাই মেনকা প্রতিবেশীদের কাছে অনুরোধ করে বলেন—

দু কথা কমল হইয়া শিবকে প্রবোধ দিয়া

রাখ সর্ব্বে উমাকে হেথায়।
কাতর হইয়া কত কহিলাম নানা মত
নারী (নাহি) রহে আমার কথায়।।
ঐ দেখ চাহিয়া মাকে কথা নাহি চান্দ মুখে
প্রভাতে লইয়া জাবে ভয়।
অকলঙ্ক শশীমুখ মলীন হইল দেখ
ভাবিতে সে ধামে দুঃখ চয়।।
কি কব শিব নির্গুণ সশানে শিবা সকুন
সদায় বেষ্টিৎ শিবালয়ে।
এমন সমান ভূমি তথা উমা জাইবা তুমি
কেমনে রহিবা এত ভয়ে।। (পৃ ৮৮)

মহামায়ার আগমনে সবর্ত্র আনন্দধ্বনির প্রবাহ ছিল। কিন্তু, উমার পুনরায় কৈলাস প্রত্যাবর্তনের ফলে হিমালয়গৃহ পরিপূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে চলেছে। সবর্ত্র বিষ°নতার ছায়া। কবি লিখেছেন—

ধুলায় পড়িয়া অন্ধ নিরানন্দে কান্দে।
পশুপক্ষ যেমন ব্যাকুল পড়্যা ফান্দে।।
দেখে নাই মাকে তাথে তার দুঃখ এই।
যে দেখেছে মাকে তার দুঃখ জানে সেই।। (পৃ ৮৮)

নগরবাসী শিবকে অনুরোধ করে উমাকে হিমালয় গৃহে রেখে যাওয়ার জন্য। তাদের বক্তব্য, অন্তত এক বছর পর নিতে আসতে হয়। কেননা—

কেবল আস্যাছে গৌরী এই তিন দিবা।
গত দুঃখ না সারিতে পুন দুঃখ দিবা।। (পৃ ৯০)

গৌরী পতিগৃহে গেলে পিতামাতা জিয়ন্তে মরা। নগরবাসীরাও নয়নতারা-হারা। নগরবাসীরাও শুনেছেন শিব ভিক্ষাতে দিনযাপন করেন। তিনি নির্গুণ—

জনরব তোমার ভিক্ষাতে দিনপাৎ।
কেবল তোমার বল কেবা তব তাত।।
সমান আলয় কয় কীরাৎ আচার।
সাক্ষি হাড়মালা গলে কি জিজ্ঞাসি আর।।
এ দোষে কি দোষ আর শুন ত্রীলোচন।
তুমি নাকি বিষ খাও এ কথা কেমন।। (পৃ ৯০)

সুতরাং, নগরবাসীরা শিবকে বলেন, " উমা রাখ্যা জাও কি মা (বা?) তুমি উমা থাক" (পৃ ৯০)।

মেনকা প্রতিবেশীদের নিকট উমার পদতলে দেখা পূর্বকথা বর্ণনা করলেন। মেনকা ভাবে, পূর্বের সেই অমঙ্গলের কারণে আজ উমার এই দুরবস্থা—

একদিন আঙ্গিনাতে উমা পাল্যাও ছ(ছু)টেতে
ধায়্যা জাইয়া করিলাম কোলে।

কহিলাম ব্যাথা (ব্যথা) কোথা উমা না কহিয়া কথা
দেখাইলা চরণের তলে।।
দেখি হরিহর বিধি অমর শিখর নিধি
সাড়ে তিন কোটী তীর্থ যত।
দেখি কাশী নীলাচল স্বর্গ খিতি রসাতল
নামের বিশেষ কত কত।।
দেখি অমঙ্গলগণ চমকিৎ হইল মন
ব্রহ্মরূপ দেখি ও চরণে।
ইথে কি কল্যান আছে ভয় হইল মন মাঝে
ইৎসা মোর তখনি মরণে।।
সেই অমঙ্গলের ফল হইল তাহি সকল
বড়াইল হইল উমাবর।
সিদ্ধ্যাদি মাদক খায় স(স্ব?)ভাব না রহে তায়
নাহি জানে কে আপন পর।। (পৃ ৯০)

সকলেই জানে হর বিষ খায়। যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন কোনো রকম ভাবে শিব বেঁচে থাকলেই মঙ্গল। তাঁর কণ্ঠে এখনও বিষ আছে। দেবতারা শিবকে পাগল জ্ঞান করেন। শিব ভিক্ষুক, দিগম্বর, তাঁর সঙ্গে দেবতাদের কেন বাদ— মেনকা বুঝতে পারেন না। শিব তো কারো মন্দ করার কথা ভাবেন না। বরং, "কারু মন্দ মাঝে নন বরঞ্চ দয়াল" (পৃ ৯১)। সুতরাং, রানি মেনকা শিবকে ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে হিমালয় গৃহে থাকার পরামর্শ দেন—

রাণী বলে কথা রাখ উমা তুমি একা থাক
সুখে রবা এ সুখ ভবনে।
... ...
করিতে না হবে ভিক্ষা হইবে শোনিৎ সিক্ষা
দশেতে জানিবে ভাল করি।
নিত্তি দিব সুভোজন শুন কথা ত্রীলোচন
ক্ষমা করো এ মিনতি করি।। (পৃ ৯২)

মাতৃহৃদয়ে যন্ত্রণার শেষ নেই। উমার কথা ভেবে মেনকা আকুল। কিন্তু, নগরবাসী তাঁকে প্রবোধিত করেন এবং উমা-বিদায়ের আয়োজন করতে বলেন। বাঙালি সংস্কৃতিতে পতিগৃহই স্বর্গ—নগরবাসীরা সেই পরামর্শই দেন। রাণীও মনে মনে সান্ত্বনা পান এই ভেবে—

সশান(া) ট্রালিকা সেই সতীর প্রধান এই
মনকে বুঝায় এই রাণি।।
ধনহীন যদি বর তবু তার সেই ঘর
সুখে দু:খে গোঙাইতে হয়। (পৃ ৯২)

উমার সখীরাও উমা বিচ্ছেদে কাতর। অতীতের নানা খেলার কথা আজ তাঁদের স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হচ্ছে। খেলায় মত্ত থেকে কোনো ভুল-ত্রুটি করে থাকলে, তা ক্ষমা করার প্রার্থনা করে।

শুনে উমা বললেন—'প্রেম মুল যথা তথা জাই' (পৃ ৯৩)। সখীরা উমার সঙ্গে চলে যেতে চান। যে দেশের যে রীতি, সেসব মেনেই তাঁরা থাকতে চান—

যেখানে জাইবা তুমি সে যদি সশান ভূমি
তবু সে সর্গের বড় মনে।
একথা শুনিতে পাই সকলে মাখেন ছাই
মাখিব আমরা তা যতনে।।
তবু সেই দুখে সুখ দেখিব তোমার মুখ
লজ্জা দিব শুন কহি হরে।
কিছু না কহিব ভবে ভিক্ষা করি খাব সবে
তবু রব দিগাম্বর পুরে।। (পৃ ৯৩)

কিন্তু, এ তো হবার নয়।

শিবের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলার পর রানির সতীর কথা মনে পড়ে এবং ভীত হন। তিনি মনে করেন, শিব যাই হোক না, নিন্দা করা ভালো নয়। পতিনিন্দা সতী সহ্য করতে পারে না—

দক্ষ ছাগমুখ দাড়ি জানে না কি সভে।
নারী গণে ভাবে না নিন্দীলে দাড়ি হবে।।
কেমনে পতির কাছে দেখাইবে বদন।
শিব নিন্দা ফল যে জানেন নারীগণ।। (পৃ ৯৪)

কাঁদতে-কাঁদতে সখীরা উমাকে সাজাতে লাগলেন। কিন্তু, অপরূপা উমাকে সখীরা কীই-বা সাজাবে! উমার রূপ ভূষণে আবৃত করতে তাঁদের কষ্ট হচ্ছে।

দশমীতে উমা পতিগৃহে গেলেন। দশমীর দুঃখ দূর করতে কার্তিকী অমাবস্যায় আবির্ভূত হলেন দেবী কালিকা। দশভূজা দুর্গার প্রত্যাগমনের পর চতুর্ভুজা কালীর আগমনে আনন্দময়তা নতুন মাত্রা পেল।

কালী সুকমল করে অস্ত্র ধরে 'কখন অসীতা কখন পীত লোহিতা কখন হয় যুবতী' (পৃ ৯৮), কখনো দীর্ঘাঙ্গী, কখনো খর্বদেহী, কখনো কৃশোদরী রূপে বিরাজমান। শুম্ভ-নিশুম্ভকে নানান রূপে প্রতারিত করেছেন। তাঁর রূপে অসুর-বাহিনী ভীত-কম্পিত। কালীর ভয়ঙ্কর রূপ দেখে দেবতারাও তাঁর কাছে যেতে পারেন না। অসুরেরাও যুদ্ধ করতে ভয় পায়—

নিশম্ভু বলএ শম্ভু কহি যাহা বুঝি।
কেন য়ই আশাতে রণেতে প্রাণে মজি।।
মণিময় ভূষণে কি এতো শোভা য়াছে।
যত শোভা সব (শব) শিব মালাতে হইয়াছে।। (পৃ ১০৫)

কালীর রক্তধারার শোভায় নিশুম্ভের মন মোহিত হয়ে গেছে। এমন এলোকেশী সুবেশ সে কখনো দেখেনি। তাই , 'নিশম্ভু বলএ রাজা রণে নাই কাজ' (পৃ ১০৫)। অথবা—

নিশম্ভু বলএ রাজা করি নিবেদন।
ব্রহ্মময়ী ঐ বামা বুঝি এ কারণ।। (পৃ ১০৭)

কাজেই, সমরে আর কাজ নেই। জবা-চন্দনে পুজো করাই শ্রেয়।

এরপর কবি দুর্গা নামের গুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহাভারতের শিবি রাজার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন: শিবিরাজা ছিলেন মহাধার্মিক। নারদের মুখে ধর্মমতির কথা শুনে ইন্দ্র ও ধর্ম শিবিরাজাকে ছলনা করতে গেলেন।

ইন্দ্র কপত এবং ধর্ম সান (শ্যন) পক্ষী হলেন। ইন্দ্ররূপী কপত সানের (শ্যনের) ভয়ে ভীত হয়ে শিবির নিকট প্রাণ রক্ষার আকুতি জানায়। শিবিরাজা তার প্রাণ রক্ষার আশ্বাস দেন। এমন সময় শ্যন রূপী ধর্ম এসে রাজাকে তার জীবন ধারণের জন্য কপতকে প্রার্থনা করে। রাজা পড়েন উভয়-সংকটে। শেষ পর্যন্ত শর্ত হয়, কপতের সমভারের মাংস রাজা নিজ দেহ থেকে দেবেন। রাজা মস্তক ব্যতীত দেহের সমস্ত মাংস প্রদান করলেও কপতের সমপরিমাণ মাংস হল না। তখন রাজা তাঁর পুত্র ও স্ত্রীকে আহ্বান করলেন এবং অনুরোধ করলেন তাঁর মৃত্যুর পর তারা যেন ধর্ম রক্ষা করেন।

প্রসঙ্গত, শিবিরাজা রমণীর পতির প্রতি আনুগত্যের উদাহরণ স্বরূপ শঙ্খাসুর ও তার পত্নী বৃন্দার কথা বলেন। পদ্মপুরাণে বৃন্দার পতির নাম জলন্ধর। বৃন্দা অসুর-পত্নী হলেও ধার্মিক। পরপুরুষের ছায়া তিনি দেখতেন না। শঙ্খাসুর রণে জয়ী হতেন বৃন্দার কারণে—

রণে জয় পতি সতী মনে পণ এই।
আমি যদি সতী হয় পতি রণে জয়ী।।
যতক্ষণ রণে পতি এই কথা মনে।
নিত্য জয় এই পণে সতীর বচনে।। (পৃ ১২১)

ফলে, দেবতারা বার-বার পরাজিত হতেন শঙ্খাসুরের কাছে। বিষ্ণু শঙ্খাসুরের রূপ ধরে বৃন্দার সতীত্ব হরণ করেন। ফলে, শঙ্খাসুরের পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়ে। শঙ্খাসুর বুঝলেন বৃন্দার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে। তাই, সে বৃন্দাকে অভিশাপ দেন। গভীর জঙ্গলে বৃন্দার অনাহারে মৃত্যু হল। বৃন্দার শবদেহের গন্ধ বায়ু-বাহিত হয়ে স্বর্গে পৌঁছাল। বৃন্দা হরির কারণে মারা যান তাই ভগবতী তাকে হরিপ্রিয়া করেন। কাজেই, শিবিরাজা বলেন, 'ধর্ম্মেমতি জার তার পশ্চাৎ মঙ্গল' (পৃ ১২৬)। পুত্র-পত্নী ধর্মরক্ষায় সম্মত হলে রাজা খড়্গহস্তে আপন মস্তক ছেদন করতে উদ্যত হন, তখন ইন্দ্র ও ধর্ম—

নারদের বাক্য দুয়ে করিলেন মনে।
সব সত্য ততোধিক দেখিল নয়ণে।। (পৃ ১৩১)

কবি সবশেষে পুনরায় কালীনামের প্রসঙ্গে এলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই কালীনাম করতে পারে—

জাত্যে ২ দিবে না কি তারে কালীধাম।
জাতের বিচার কি যে করে কালীনাম।।
কাল কিশে কাল কাষ্ট আগুনের আলো।
নীচ হইলে কি দোষ মনেতে যদি ভাল।।
শরীর চণ্ডাল জার মন কি চণ্ডাল।
ইষ্টে মতি রাখ্যা যদি কাটিলে সেকাল।।
শরীর চণ্ডাল বটে ছুতে তাকে নাই।
কি খেতি তাহারে যদি ছুলে না সভাই।।
জতী (জাতি) বিচারেতে কই সে নীচের নীচ।
কালীপদে ভক্তি রল্যে হয় বিশ্ববীজ।।
চণ্ডাল উত্তম যদি ভাবে সে চরণ।
দ্বিজেতে কি গুণ যদি না করে ভজন।। (পৃ ১৩২)

আসলে মুক্তির জন্যই ভক্তি। নীচ হলেও ভক্তির জন্য উত্তম হয়। জাতি বিচারে উত্তম-অধম নির্ধারিত হয় না। সকলের মূলে হল ভক্তি ও ভজন—

বিদ্যা আছে ভক্তি নাই সেই বিদ্যা কেন।
তেজোময় তনু তার চক্ষু নাই জান।। (পৃ ১৩২)

সুতরাং, ভক্তির মধ্য দিয়েই মুক্তি হয় জাতের বিচারে নয়। চৈতন্যের ভক্তিধর্মই এই অংশে প্রতিফলিত।

কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব:

১। এই কাব্যে চৈতন্যোত্তর যুগের বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কোনো বিশেষ কাল্ট নয়, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব—মধ্যযুগের বাংলার প্রধান তিন সম্প্রদায়কে এই কাব্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, বর্ণ নয়, কর্মে মানুষ শ্রদ্ধেয় হয়—কবি এই ভাবনাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। চৈতন্যদেব আপামর মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তারই প্রভাবও এই শাক্তসাহিত্যে অত্যন্ত প্রকট।

২। কাব্যের নাম 'গৌরীমঙ্গল' হলেও পৌরাণিক কাহিনির পুরোপুরি অনুসরণ নেই। এই কাব্যে চণ্ডী এবং কালী দুই দেবীরই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত। তবে লক্ষণীয় মহিষাসুর বা নিশুম্ভ দু-জনই দেবী দুর্গা ও কালিকার একনিষ্ঠ ভক্ত। পুরাণে এই দুই দৈত্যের মধ্যে এই ভক্তিধর্ম লক্ষিত হয় না। পুরাণে এরা দেবীর সক্রিয় প্রতিপক্ষ কিন্তু এই কাব্যে তারা সনিষ্ঠ ভক্ত। কাব্যের শেষে, কবি জাত-ধর্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কবি যে কথা বলেছেন, তা থেকে সুস্পষ্ট যে, শত্রুজ্ঞানে নয়, ভক্তির গুণে অসুরেরা মুক্তি পেয়েছে।

৩। সৃষ্টির বর্ণনায় কবি ধর্মমঙ্গলকে অনুসরণ করেছেন। 'শূন্যপুরাণ-এ নিরঞ্জন 'নারাঅন' শব- রূপ ধারণ করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে ছলনা করতে আসেন—

দুর্গন্ধ পাইআ বম্ভা ভাইসিতে লাগিল।
তিন অঞ্জলী জল দিআ ভাসাইআ দিল।।
তথা হইতে মহাপরভু ভাইসিতে ভাইসিতে।
সব রূপ হএ গেল বিষ্টুর আগুতে।।
দুর্গন্ধ পাইএ তবে বিষ্টু মহাবলী।
ভাসাইআ দিআ দিলা তারে দিআ তিন অঞ্জলী।।
ভাসিআ ভাসিআ পরভু করিল গমন।
সিবের নিকটে গিআ ভাসে নারাঅন।।
দুর্গন্ধ পাইআ সিব ভাবে মনে মন।
কুথাকার জন্ম নহি মরিল কুন জন।।
... ...
পচা গন্ধ মড়া হএ আইলা নারাঅন।
চিনিতে নারিল আহ্মার ভাই দুই জন।।

(ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : 'শূন্যপুরাণ', ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ ৮২)

আলোচ্য কাব্যেও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে কালী গলিত মৃতদেহ রূপে এসে ছলনা করেছেন—

ভাষা আইলা বিষ্ণু কাছে ভুলে তিন সব কাছে
পলাইলা তন্ত্রে এই বটে।।
গন্ধে চারিদিগে বিধি মুখ ফিরাইল যদি

ইথে চারি মুখ হৈল তার।
তথা হইতে শক্তি সেই ভাষে যথা গেলা কই
শুন সর্ব্বে সেকথা বিস্তার
সেই পচা সব (শব) কায় লাগিল শিবের গায়
তবু নাহি শিবের চেতন।
... ...
পচা সব (শব) কীট তায় গলে খসে লাগে গায়
শিব লইয়া করিলা আসন ।। (পৃ ২০-২১)

যদিও কবি বলছেন, এই ঘটনা তন্ত্রে উল্লিখিত আছে।

৪। পুরাণের দক্ষযজ্ঞ ও বাংলা উমা-সংগীতের কাহিনির মেল-বন্ধন দেখা যায় এই কাব্যে। ভাগবত সহ অন্যান্য পুরাণে দেখা যায়, শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে অনাহূত সতী দক্ষের যজ্ঞ যান এবং যজ্ঞসভায় শিবনিন্দা শ্রবণ করে আত্মাহূতি দেন। সতীর পূর্বজন্মের এই ঘটনা শিবকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। তাই, শিব দুর্গাকে হিমালয়-গৃহে যেতে দিতে চান না। শিবের ভয়, পুনরায় যদি পূর্বের মতো কোনো অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটে। শিব এরপর দুর্গাকে পূর্বের সমস্ত ঘটনা বললেন। সব শুনে দেবী বললেন—

কহিলা শিবকে উমা এ প্রবোধ বাণি।
হীমালয় পিতা মোর তব ভক্ত জানি।।
কোন ভয় নাহি তার ভবনে জাইতে।
প্রবোধ মানহ মনে ভয় না হইতে।। (পৃ ৫৬)

শিব উমাকে পিত্রালয়ে যেতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু জানালেন : "তুমি ছাড়া হইলে আমি শিব নহি সব (শব)" (পৃ ৫৮)। কাজেই, শিবও উমার সঙ্গে হিমালয়ে যেতে চান। বোঝা যায়, প্রচলিত কাহিনি থেকে এই কাব্যের স্বাতন্ত্র্য এবং নতুনত্ব। আর একটি অভিনবত্ব হল; শিব যেতে চাইলেও পার্বতী তাতে অসম্মত হয়েছেন। কারণ, শিবের বেশভূষণ। তাঁর বাঘছাল সর্পবন্ধনে আবদ্ধ। তাই উমার উক্তি—

সাপে বাগছালে বান্ধা জাবা গিরিপুর।
পলাবে ভুজঙ্গ যদি দেখায় ইমুর ।। (পৃ ৫৯)

অন্যদিকে, শিবের ভয় পিতামাতাকে পেয়ে পাছে দুর্গা তাঁকে ভুলে যায়। বোঝা যায়, কবি এই কাব্যকাহিনিতে শিব-দুর্গার প্রেমকে মানবিক করে তুলেছেন এবং নানান দিক থেকে নতুনত্ব দান করেছেন।

৫। বাংলাদেশে দুর্গোৎসবের পর আসে কালীপূজা। কবি এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। উমা তিন দিন পিত্রালয়ে এলে পিতৃভূমি আনন্দ-হিল্লোলে মেতে ওঠে। দশমীর দিন প্রভাতেই শিব আসেন উমাকে কৈলাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মানুষের আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। তাই, মর্তবাসীকে আনন্দ দিতেই কার্তিকি অমাবস্যায় কালিকারূপে দেবীর পুনরাগমন ঘটে।

৬। কাব্যটি বৃহৎ এবং অতিকথন-দোষে দুষ্ট । সর্বোপরি, ঘটনা বিন্যাসে অসামঞ্জস্য থাকলেও কাব্যত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

কালী ও কৃষ্ণ অভেদ প্রসঙ্গে—

জল জল দৃঢ় হইয়া হয় যেন শিল।
পুন সীলা গলিলে সে জানি মা সলীল।।

জল হয় শিলা পুন শিলা গলে জল।
জলে শিলে কি ভেদ ভেদকে ধরে ছল।। (পৃ ১০)

আর একটি উদাহরণ—

করিতেছ ভাগ জল জলে দিয়া রেখা।
এ রেখায় দুভাগ ভেদকে পায় দেখা।। (পৃ ১৫)

মহিষাসুর বীর। কিন্তু, তাঁর এই সৌর্য বা বীর্য তো মহাদেবের বরের কারণে। কাজেই, মহিষাসুরের কাছে দেবতাদের এমন পরাজয়ের জন্য প্রকৃতপক্ষে শিবই দায়ী। অথচ ফল ভোগ করতে হবে মহিষাসুরকে। তাই, মহিষাসুরের যা জিজ্ঞাসা, তা একালের যুক্তিবাদী মানুষেরই কথা—

শিব তুমি দয়াময় জানি তা মনে।
দয়া করি নির্দয় দয়ার মাঝে কেনে।।
আমার পিতাকে ব দিলা কেন তুমি।
না দিলে এমন বর বাঁচিতাম আমি।।
পিতাকে ভুলাল্যা তুমি মিছা বর দিয়া।
এই বর পালে পিতা তোমা আরাধিয়া।।
... ...
মনেতে রাখিলা দেবীহাতে মৃত্যু হবে।
মুখেতে কহিলা বর না পারিবে দেবে।। (পৃ ৭৮-৭৯)

কবি এই মানবিক জিজ্ঞাসাকেই উপমার সাহায্যে ব্যঞ্জিত করেছেন—

মধু মধ্যে বিষ যেন করিলে পান।
বুঝিতে নারিলা পিতা কুচক্র বিধান।।
লোহার কণ্টক যেন আহারে চাকিয়া।
দাতা হইয়া মীন বধে দুরেতে থাকিয়া।।
অন্ধজন কি জানে যে কুপ ঢাকা পথে।
পরবাক্য প্রর্ত্তয়ে পড়িল অন্ধ তাথে।।
পাতা লতা খাইতে দিয়া পশু বধে যেন।
ভাল মাঝে এতো মন্দ বর দিলা কেন।। (পৃ ৭৯)

পৃথিবীতে সকলের সমান অধিকার বাঞ্ছনীয়। বর্ণভেদে অধিকারের স্বাতন্ত্র্য মানবিক দিক থেকে গ্রাহ্য নয়। কবি মহিষাসুরের কণ্ঠে সেই কথাই শুনিয়েছেন। এখানেই এই কবি মানসিকতায় আধুনিক—

দেবপক্ষে দুর্জ্জন মামি (মা+আমি) বটে মা প্রমান।

সুরাসুর সুখ ইচ্ছা দুয়ের সমান।।
একদ্রব্য অভিলাষি হইলা দুইজনে।
মৈত্রতা নাহি থাকে সত্র (শত্রু) দুয়ে গণে।।
... ...
স্বর্গ মর্ত্ত সুখের নাহিক কার সাধ।
জার বল নাই সে না করে বিবাদ।। (পৃ ৮৩)

অর্থাৎ, মহিষাসুরের ক্ষমতা আছে তাই সে বিবাদ করেছে। সুতরাং, কবি গৌরীমাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য রচনা করলেও এখানে কবি দেবীর অযৌক্তিক অমানবিক দৈবিকতার বিরোধিতাই করেছেন।

কবি কথায় কথায় যুক্তিদান করতে গিয়ে প্রচুর উপমা অলংকারের ব্যবহার করেছেন। কেবল তাই নয়, বিরোধমূলক অলংকার বিরোধাভাসেরও নিদর্শন লক্ষিত হয়—

যে হাঁড়ির তল নাই অন্ন হয় তাই।
জার মুখ পেট নাই সেই অন্ন খায়।।

... ...

নিরাকার চক্ষু নাই ত্রিজগতে চান।
চরণ নাহিক তথা ইৎসা যথা যান।। (পৃ ৫)

সবশেষে বলা যায় যে, কবি সমকালীন সমাজিক-ধর্মীয় ইতিহাসের নানা খুঁটিনাটি বর্ণনা যেমন দিয়েছেন, তেমনি বহু প্রবাদ ও প্রাবাদতুল্য বাক্য প্রয়োগ করে কাব্যটিকে রসগ্রাহী করে তুলেছেন। তবে একথা ঠিক, কাব্যের কাহিনি ও ঘটনার বর্ণনার ফাঁকে-ফাঁকে কবির মতামত এবং বহুবিধ উদাহরণের জন্য নানান প্রসঙ্গের অবতারণা কাব্যের সংহতি নষ্ট করাছে। বৃদ্ধ কবির অথিকথনও এই কাব্যের একটি ত্রুটি। তবুও পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে এই কাব্যের স্বাতন্ত্র্য।

বিঃ দ্রঃ :

১। বর্তমান প্রবন্ধটি ইউজিসি-র অর্থাকূল্যে মেজর রিসার্চ প্রজেক্টের অন্তর্গত গবেষণা কর্মের অংশবিশেষ।
২। উদ্ধৃত অংশে পুঁথির বানান অপরিবর্তিত আছে। প্রয়োজনে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সংশোধিত বানান বা অনুমিত পাঠ লিখিত হয়েছে।